ধারাবাহিক রচনা

কলকাতায় প্লেগ : ভগিনী নিবেদিতা ও সমসময়

স্বামী ঋতানন্দ

(মে ২০১৭ সংখ্যার পর)

উল্লেখ্য, ১৮৯৮-এর কলকাতা প্লেগ নিবারণের কাজে অন্যান্যদের সঙ্গে স্বামী সুবোধানন্দও কঠোর পরিশ্রম করেন। পরবর্তী কালে ১৯৪২-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় 'Prabuddha Bharata' পত্রিকা লেখে (পৃঃ ৫৭৫) : "During the great epidemic plague in Calcutta in 1898 when the Ramakrishna Mission plague service was instituted Swami Subodhananda was one of those who worked hard for the relief of the helpless and panic-stricken people."

গৃহত্যাগী সন্ন্যাসিসঙ্ঘের অভাবনীয় এই কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশ কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় প্লেগ-সেবাকার্য করতে চাইলে স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি প্রচার করতে এবং স্বহস্তে শহরের গলিঘুঁজি ও ঘরদুয়ার পরিষ্কার করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার উপদেশ দিতেন। বহু রোগী এসময় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে সেবাশুশ্রূষা লাভ করেছিল এবং স্বামীজীর ওপর জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যে-বিশ্বাস ও নির্ভরতার সুফল পরের বছরের প্লেগ-সেবাকার্যকে অধিক ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করেছিল।[৩০]

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের প্লেগ-সেবাকার্যে নিবেদিতা কতটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার প্রামাণ্য নথিপত্র এখনও পর্যন্ত সব পাওয়া না গেলেও প্লেগরোগীদের জন্য বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা যে-ক্যাম্প বা অস্থায়ী হাসপাতাল খুলেছিলেন তাতে হয়তো খানিকটা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপদেষ্টার ভূমিকা স্বামীজীর সঙ্গে তিনিও গ্রহণ করেছিলেন বলে অনুধাবন করা যায়। কারণ, মানুষের সামান্যতম বিপদে নির্লিপ্তভাবে বসে দিন কাটানো, কেল্টিক রক্ত ধমনীতে ধারণ করে এই নারীর পক্ষে অসম্ভব। আর প্লেগ বিষয়ে বেশ খানিকটা সচেতনতা তাঁর পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতাতেই ছিল। পরবর্তী কালে 'The Plague' প্রবন্ধে তিনি নিজ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন : ''প্রকৃত প্লেগ কি না বোঝার জন্য ওপর ওপর দেখলে বোঝা যায় না। তার জন্য গভীরে প্রবেশ করতে হয়। প্রথম এই রোগের ধ্বংসলীলার কথা শুনেছিলাম এক ইউরোপীয় ভোজসভায়, তারপর বাড়ি ফিরে শুনলাম, আমাদের বাড়ির রাস্তাতেই এক সপ্তাহে সাতজন মারা গেছে।''[৩১]

উক্ত প্রবন্ধে আরও লিখেছেন, ''যখন ইউরোপে আমরা শুনি যে, কোনও স্থান

রোগ-অধ্যুষিত বলে ঘোষিত হয়েছে তখন আমরা সবরকমের মৃত্যুর কথা কল্পনা করে নিই। যেমন, জনহীন পথে ঘাস গজিয়েছে, বাড়িগুলোর গায়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকা এবং মাঝরাতে অদ্ভুতস্বরে কে যেন বলছে, 'তোমাদের মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এস!' "[৩২]

সুতরাং ধরেই নেওয়া যায়, পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবাকর্মীদের নিবেদিতা নিশ্চয়ই সক্রিয়ভাবে যথাসাধ্য সহায়তা করেছিলেন, সচেতন ও সাবধান করেছিলেন।

তবে মে মাসের ১১ তারিখ বুধবার [স্বামী গম্ভীরানন্দ ও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা-র অভিমত] কিংবা মে মাসের ১৩ তারিখ বুধবার [স্বামী সুবোধানন্দের পত্র : রবিবার, ১০.০৫.১৮৯৮ অনুসারে] আলমোড়া গমনের পূর্ব-পরিকল্পনা থাকায় নিবেদিতার সেই সক্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হয়তো ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা স্বামীজীও এই তেজোদীপ্ত প্রাণটিকে ভাবী কর্মবন্যায় উৎসর্গ করার জন্য আরও তৈরি করে নিতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের সেবাভাব ও ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মৃত্যুকে ভালবেসে সেবাপূজায় জীবন বলি দেওয়ার মধ্যে যে-পার্থক্য রয়েছে, তার ট্রেনিংও স্বামীজী দিতে চেয়েছিলেন এই হোমাগ্নিশিখাটিকে।

তাছাড়া কলকাতার ১৮৯৮ সালের প্লেগ প্রকৃতই প্লেগ, নাকি panic সে-বিষয়ে তখনও সংশয় ছিল। বড় বড় ডাক্তাররাও সে-ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ১৪ মে-র পত্র থেকে জানা যাচ্ছে : ''আজকাল কলিকাতায় প্লেগের বড় panic হইয়াছে। অনেক লোক শহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। প্রধান প্রধান ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে প্লেগ নয়। এখনো ঠিক জানা যাইতেছে না। স্বামীজী আমাদের প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে যদ্যপি কলিকাতায় যথার্থই প্লেগ হয়, তাহা হইলে Hospital এবং segregation house করিয়া ভদ্র এবং দরিদ্রগণকে সেবাশুশ্রূষা করিতে হইবে। কলিকাতায় স্থান দেখা যাইতেছে।"[৩৩]

এমনই এক সংশয়পূর্ণ দোলাচলের কালে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা নিশ্চয়ই ভগ্নস্বাস্থ্য স্বামীজীকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তাঁর সৈনিকরা তাঁর আদেশ পালনের জন্য সহাস্যে মৃত্যুবরণ করতেও সদাপ্রস্তুত; সে-কারণে স্বামীজী নিশ্চিন্তে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। সঙ্ঘকার্য এক ধরনের নয়। কেবল একটিমাত্র কার্যে দলনেতা কখনও আবদ্ধ হয়ে থাকেন না—থাকা উচিতও নয়। বিশেষত সংক্রামক রোগাক্রমণের আশঙ্কায় পাশ্চাত্য থেকে আগত মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা প্রমুখকে নিয়ে চিন্তিত সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এছাড়া পাশ্চাত্যবাসিনীরা প্রকৃত ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত হতে চান। এজন্য প্রয়োজন ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের সঙ্গে, অধ্যাত্ম ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর। পূর্বেই উল্লেখিত, স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ইচ্ছা ছিল স্বামীজী তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যেন পুনরায় পাশ্চাত্যে গমন করেন। হয়তো তিনি স্বামীজীর অকারণ কলকাতাবাসে আপত্তি জানিয়ে অন্তত হিমালয়ের কোলে শীতপ্রধান অঞ্চলে কিছুদিন কাটানোর জন্য সর্নিবন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

যাই হোক, 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে কিছু 'লক্ষ্যে অবিচল' সন্ন্যাসী আপ্রাণ প্রচেষ্টায় অজ্ঞ জনগণের বিশ্বাস অর্জন করে প্লেগসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবার কর্মচক্র চালু হয়ে গেছে দেখে স্বামীজী মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস প্যাটারসন ও নিবেদিতা এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ সহ রওনা হলেন আলমোড়ার পথে—মি. ও মিসেস সেভিয়ারের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে। সেবারের মতো উত্তরভারতের পথে যাত্রা করলেও স্বামীজী কলকাতার প্লেগসমস্যা বিষয়ে ও তার

খবরাখবর গ্রহণ ও নিজ মতামত প্রদানে সর্বদাই তৎপর ছিলেন। বেশ কিছু পত্রে তারই প্রতিচ্ছবি।

২০ মে ১৮৯৮ আলমোড়া থেকে স্বামীজী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখেন, ''ওখানে যে দুই-একটি case এক্ষণে হইতেছে, তাহার জন্য সরকারী প্লেগ হাসপাতালে অনেক জায়গা আছে এবং ward-এ ward-এ হাসপাতাল হইবার কথা হইতেছে। এসকল দেখিয়া ও আবশ্যক বুঝিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। তবে বাগবাজারের কে কি বলছে, তাহা public opinion নহে জানিবে।... আবশ্যক-কালে অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়— এইসকল দেখিয়া কাজ করিবে।'' ১৭ জুলাই শ্রীনগর থেকে ব্রহ্মানন্দজীকে লেখেন, ''কলিকাতায় শুনিতেছি নাকি প্লেগ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।'' ১ আগস্ট আবার তাঁকে লেখেন, ''প্লেগ সম্বন্ধে সব লিখেছি। মিসেস বুল ও মূলার প্রভৃতির মত যে, যখন পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল হয়ে গেল, তখন মিছে কতকগুলো টাকা খরচ কেন? We will lend our services as nurses etc.''[৩৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৯৮-এর প্লেগ, প্লেগাতঙ্ক ও তার প্রভাব আরও বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিল। ১৭ মে ১৮৯৮ প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা শ্রীম-র পত্রাংশ : "We continue to be under the cold shadow of the plague regulations."[৩৫] আবার লালা বদ্রীশাহকে লেখা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ৪ জুনের পত্র থেকে জানা যাচ্ছে : ''সহরে প্লেগের ভীতি এখনও রহিয়াছে। আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু প্লেগ হাসপাতালে দেখিতে গিয়াছিলেন কলিকাতার প্লেগ আসল প্লেগ কি না। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই প্লেগের লক্ষণের সঙ্গে আসল প্লেগের মিল আছে।

''ভগবান না করুন, এখন আশঙ্কা হয় এই বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে চারিদিকে উহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে।''[৩৬]

অর্থাৎ জুন মাসেও কলকাতার প্লেগ প্রকৃত প্লেগ কি না তা নিয়ে সংশয় চলছে। সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে তখনও আসা যায়নি। ১৮ জুন ১৮৯৮ ব্রহ্মানন্দজীর অপর পত্র থেকেও জানা যাচ্ছে রোগের প্রকোপ তখনও চলছে : ''কলিকাতায় প্লেগের আন্দোলন খুব চলিতেছে। শুনিতেছি, ২/৪ জনের মৃত্যু নিত্য হইতেছে। কেহ বলে, একটু সন্দেহ হইলেই হাসপাতালে যাইতেছে। যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় না হইলেই মঙ্গল, নচেৎ বাংলাদেশ ছারখারে যাইবে।''[৩৭]

স্বামী অখণ্ডানন্দের ৩ জুলাই ১৮৯৮ প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা পত্র থেকে জানতে পারি, তিনি ওই সময় মুর্শিদাবাদের মহুলায় অনাথ বালকদের আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত। অর্থসংকট চলছে। তবুও প্লেগসেবায় অর্থসাহায্য করতে তিনি বদ্ধপরিকর : ''মহাশয়! আমাদের বেলুড় মঠের অনেক খরচ। বাড়ি ভাড়াই ৮৫ টাকা। এ পোড়া দেশের কটা লোক সাহায্য করেন বলুন দেখি। তারপর সম্প্রতি আবার plague রোগীদের সেবার জন্য আমাদিগকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে।''[৩৮]

যাই হোক, রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবাকার্য সেবার নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলেছিল। বিশেষজ্ঞ Dr. Haffkein-এর রিপোর্ট অনুযায়ী রুগিদের জন্য পৃথক বাসস্থানের (Segregation camp) ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩৯] তবে সে-বছর প্লেগ বিধ্বংসী মহামারির আকারে কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েনি। নথিবদ্ধ স্বাস্থ্যবিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে, ১৮৯৮-এ ''বঙ্গদেশে ১৫৫ জনের মহামারী রোগে মৃত্যু হইয়াছে।''[৪০]

সাত

দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্রোড়ে শিবগুরুর নিরন্তর দুর্লভ সান্নিধ্য পেলেন নিবেদিতা। বক্তাও আশ্চর্য, লব্ধাও কুশল। চলল ভাঙা-গড়া। অবর্ণনীয় মানসিক সংগ্রাম। ভারতবর্ষের চিন্ময়ী মূর্তিকে

আবিষ্কার ও একাত্ম হয়ে যাওয়া। শিবগুরু তাঁকে দিলেন 'মৃত্যুধ্যান'-এর দীক্ষা। ''ভগবান শুধু মঙ্গলেই আত্মপ্রকাশ করেন না, অমঙ্গলের মধ্যেও তাঁরই বাম মূর্তি। যে প্রকৃত বীর, সে বিবেকের ক্ষুরধার পথে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চায় রুদ্রের শাশ্বত সাযুজ্য। অহন্তার পুষ্টি নয়, চাই তার মরণ। সেই মরণের ওপারেই মহাজীবনের ভাস্বর মহিমা।... মার্গটি, মরণকে ভালবাসতে শেখো, ভয়ঙ্করের পূজা করো।... জীবনে মরণ আর মরণে জীবনকে দেখতে শেখো। রুদ্রের অর্চনা করো, মার্গটি।''[৪১]

মৃত্যুকে ভালবাসলেন নিবেদিতা। আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনের সাধনায় ব্রতী হলেন। শান্ত হলেন নিবেদিতা। সামনে ফেলতে হবে আরও সুদীর্ঘ পদক্ষেপ। প্রস্তুত তিনি।

উত্তম বৈদ্যসম নিষ্ঠুর গুরু কর্মতপস্যায় ঠেলে দিলেন নিবেদিতাকে : ''তোমার কাজই তোমার সাধনা, তোমার সিদ্ধি।''[৪২]

১৮৯৮-এর ১ নভেম্বর থেকে ১৮৯৯-এর ২০ জুন স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে গমনের পূর্বকাল পর্যন্ত নিবেদিতা ভারতবর্ষে তাঁর প্রথম পর্যায়ের বিরামহীন কর্মস্রোতে আত্মোৎসর্গ করলেন।

১৩ নভেম্বর রবিবার, শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন কলকাতার বাগবাজার পল্লির ১৬ নং বোসপাড়া লেনে মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল।

১৮৯৯। দেশের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নানা স্থানে দেখা দিল প্লেগ—মহামারিরূপে। কলকাতা শহরেও প্লেগের ছায়াপাত। মিসেস কলস্টনকে ১ মার্চ ১৮৯৯-এর পত্রে ভারতের কাজে আহ্বান জানাচ্ছেন নিবেদিতা। সেখানে প্রাথমিকভাবে বর্ণিত হচ্ছে প্রকৃত কর্মীর সুদীর্ঘ যাত্রাপথে অগ্রসর হওয়ার সচেতন পদক্ষেপের দৃষ্টিভঙ্গি আর ভারতীয় জনগণের স্বাস্থ্য-সচেতনতা জাগানোর অঙ্গীকারের আভাস :

''এদেশে আমাদের সব কাজের পিছনে থাকে জগৎকল্যাণ এবং ব্যক্তিগত কর্তব্যপালন—এই দুটি ভাবই কাজ করে।... এদেশ যদি যথার্থ আপনার কর্মক্ষেত্র হয়, তাহলে আপনা থেকেই সব বাধা অন্তর্হিত হবে। কিন্তু শুধু মৃত্যুবরণ করার জন্য আসবেন না। সেটা হবে সাংঘাতিক। কলকাতায় অল্পবিস্তর প্লেগের আক্রমণ আবার দেখা দিয়েছে। প্লেগাক্রান্ত অঞ্চলের কাছাকাছিই আমাদের বাসস্থান। সুতরাং আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকবেন। রোগীর সেবা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে কিছু কাজ করা যায়। তবে এই নয় যে, ওই কাজ আমাদের করতেই হবে, শুধু এই মেয়েদের কতকগুলি সাধারণ অভ্যাস, রোগের সময় কিছু কিছু সাবধানতা অবলম্বন যে কতটা জরুরি তা শেখাতে হবে। রোগাক্রান্ত হলে সামান্য সেবারও অন্য মূল্য এখানে। মনে করুন, অনেকখানি সময় দিয়ে রোগীর দেহে ওষুধ লাগিয়েছেন, সযত্নে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছেন। কিন্তু যেই তাদের দৈনিক ঠাণ্ডা জলে স্নানের সময় হবে, একটুও চিন্তা না করে তারা ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে দেবে এবং স্নানের সঙ্গে ওষুধ ধুয়ে ফেলবে অর্থাৎ আপনার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। এ-ধরনের কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে একটি শক্তিই কার্যকরী হতে পারে, তা হল শৈশব থেকে বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদের শিক্ষিত করে তোলা।''

অর্থাৎ পত্র থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, প্লেগসেবাকাজে সম্পূর্ণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত তখনও গ্রহণ করা হয়নি। এ-সময় স্বামীজীর শরীর একেবারেই ভাল যাচ্ছিল না। মার্চ মাসের দিকে "...he was growing better and stronger everyday."[৪৩] জুন মাস পর্যন্ত কলকাতাতেই থাকার ইচ্ছা তাঁর।

রবিবার, ১২ মার্চ ১৮৯৯। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার পত্রাংশ : ''এরপর আমরা আমাদের আশপাশের জায়গায় প্লেগের ভয়াবহতা নিয়ে এবং প্লেগ যে সারা বাংলায় ছড়িয়ে

পড়েছে—তা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। প্লেগ-অধ্যুষিত কয়েকটি এলাকা থেকে মঠের কাছে অনুরোধ এল দুই-তিনটে ছেলেকে সেবাকাজে পাঠানোর জন্য। আমি তাদের পাঠানোর জন্য স্বামীজীকে জোর করলাম। তিনি বললেন, স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে এমন দুই-তিন জন ছেলেকে তিনি ছাড়বেন। এবং তারা ঠাকুরের তিথি পুজোর পর বাংলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে মানুষকে সহানুভূতি দান করবে এবং যথাযথ সংবাদ আহরণ করবে। তাদের মধ্যে একজন (একটি সুন্দর, কালো ছেলের কথা না বলে পারছি না) বলে উঠল, ''এই কাজে যে প্রথম নিজের জীবন দান করতে পারবে, সেই হবে এর স্তম্ভস্বরূপ।''[৪৪]

২৩ মার্চের পত্রে মিস ম্যাকলাউডকে পুনরায় লিখলেন : ''I don't fancy the plague will upset Swami's plans. We shall not be deeply involved now. But it is a terrible scourge.'' উক্ত পত্রেই লিখছেন, ''কী ভয়ঙ্কর! চারিদিকে মানুষ মরছে অথচ কিছু করার নেই।''

সত্যিই কি কিছু করার নেই? স্থির হয়ে কালক্ষেপ করা কি সম্ভব নিবেদিতার পক্ষে!! সেকালে এ-রোগের ভবিতব্য অনুসারে, রোগাক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রীর ক্ষেত্রে হয়তো নয়, কিন্তু রোগসংক্রমণ রোধ তো করা যায়! মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম বিদায়লগ্নে পরমাত্মীয়ের মতো উপস্থিত থাকা তো যায়! মৃত্যুদীক্ষা, মৃত্যুকে ভালবাসার শিক্ষা তো স্বামীজী তাঁর শিষ্যাকে আগেই দিয়েছেন।

২৫ মার্চ ১৮৯৯; 'নিবেদিতা' নাম প্রদানের ঠিক এক বছর পরে স্বামীজী নিবেদিতাকে দিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য।

২৮ মার্চ ১৮৯৯। স্বামী যোগানন্দ চলে গেলেন এ-মর্ত্যভূমি ত্যাগ করে। মৃত্যু নিবেদিতাকে দিয়ে গেল এক কঠোর শিক্ষা—কী শান্ত, বীরের মতো মরণকে গ্রহণ!

প্লেগ-সেবাকার্যের মহারণে ঝাঁপ দেবার আগে দু-সপ্তাহ ছুটিতে ছিলেন নিবেদিতা। সেইসময় ৩০ মার্চ ১৮৯৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ''আমি দু-সপ্তাহ ছুটিতে ছিলাম—অর্ধেকটা প্লেগের জন্য, আর বাকি অর্ধেকটা সত্যিই আমার প্রয়োজন ছিল।''

১৮৯৯-এর কলকাতার প্লেগ—১৮৯৮-এর মতো কিন্তু খানিকটা জানান দিয়ে বিদায় নিল না। ঝঞ্ঝার মতো আছড়ে পড়ল কলকাতার বুকে। এবার স্বামীজী প্রস্তুত। করব, না হয় মরব। এক ঘরোয়া আলোচনায় বললেন, ''বাংলাদেশ সফর করে তিনি সকলকে উদ্দীপ্ত করবেন।... এই প্লেগ-সেবার কাজে যার মরণ হবে সে হয়ে দাঁড়াবে আমাদের আদর্শের স্তম্ভ।''[৪৫]

সেবাকার্যের জন্য কয়েকজন ডাকাবুকো সন্ন্যাসীকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন স্বামীজী। সেবাত্রাণের ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থসংগ্রহ সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বাগবাজার পল্লির বিশ্বাস অর্জন করে ফেলেছে এই সন্ন্যাসীর দলটি। আগের বছরই পল্লিবাসীরা দেখেছে সন্ন্যাসীরা কোয়ার‍্যান্টিন খুলেছেন, রোগীর সেবা করেছেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে। বিগত বছরের গভর্নমেন্ট প্রবর্তিত স্বাস্থ্যবিধিগুলি জাতিভেদ প্রথার প্রতিকূল। তাতে সাধারণ মানুষ রুষ্ট হয়, খেপে উঠে তার বিরোধিতা করে। পরবর্তী সময় অবশ্য গভর্নমেন্ট তাদের নির্দেশিত নীতিগুলির খানিকটা পরিবর্তন করে। যাই হোক, মহামারির সংক্রমণের থেকে অব্যাহতির জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ যে অত্যন্ত প্রয়োজন, সে-বিষয়ে সংবিৎ জেগেছে জনগণের। স্বামীজীর মধ্যস্থতায় অবস্থার উন্নতি ঘটে।

সাহায্য-সমিতি গড়তে চান স্বামীজী। তার জন্য তিনি নির্ভর করলেন নিবেদিতা এবং আর দুজন সন্ন্যাসীর ওপর। নিবেদিতাকে বললেন, ''পাড়াটাকে আমরা বাঁচাবই। সে-ভার তোমার উপর রইল। অনেক ঝাড়ুদার দরকার, সেজন্য লোক চাই।''[৪৬]

স্বামীজীর ইচ্ছাকে সফল করতে নিবেদিতা নিলেন প্রধান ভারটি। ভয়াল মহামারি প্লেগ। তার প্রতিরোধে যথার্থই পথে নামলেন এক শ্বেতাঙ্গিনী। বিস্ময়ের বিস্ময়। অচিন্তনীয়। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে একটা কমিটি গঠন করা হল। নিবেদিতা সম্পাদিকা, স্বামী সদানন্দ প্রধান কার্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য কর্মী হলেন—স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ।

ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই প্লেগ নিবারণ করার প্রথম ও প্রধান উপায়। কিন্তু দরিদ্র বস্তিতে তা হওয়া একরকম অসম্ভব। উদ্বোধন পত্রিকায় লেখা হল : ''সহরের মধ্যে যদি কোন স্থানে অনেকগুলি গরীব কুটির বাঁধিয়া বাস করে, সেই স্থানকে 'বসতি' বলে। বসতির লোকেরা প্রায় নিম্নশ্রেণীর হইয়া থাকে; কেমন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, তাহারা তাহা জানে না, জানিলেও অর্থাভাবে অক্ষম। ভারতসম্রাজ্ঞীর রাজধানী হইলেও, কলিকাতায় এরূপ বসতি বা গরীব পল্লী অনেক। প্লেগ প্রথমে বসতিই আক্রমণ করেন; পরে ক্রমশ প্রাসাদাদিতে প্রবেশ করেন।''[৪৭]

৩১ মার্চ ১৮৯৯, গুডফ্রাইডের দিন কাজ শুরু হল। স্বামীজী নিজে এসে দরিদ্র পল্লিতে বাস করতে লাগলেন—জনগণের মনোবল বাড়াতে ও কর্মীদের উৎসাহ দিতে।[৪৮] স্বামী সদানন্দ সাতজন ধাঙড় নিয়ে তাদের সঙ্গে নিজে বোসপাড়ার বসতি সাফ করতে শুরু করেন। ৫ এপ্রিল নিবেদিতা চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন : ''একেবারে ভোর থেকে সদানন্দ বীরের মতো তার ঝাড়ুদার-বাহিনীর তত্ত্বাবধান করছে। তার কল্যাণে এখানকার বস্তি ও গলির নতুন চেহারা। গতরাত্রে প্লেগ সম্বন্ধে প্রচারপত্রগুলি এসে গেছে। আজ হবে সেগুলির বিতরণ—সেইসঙ্গে জীবানুনাশকের বিতরণও।'' ঐ পত্রেই লিখলেন : "I was out trying to start a Sanitation Fund and get letters into English Papers. I saw the Pattersons—Rutters—and Salxers." ওই পত্রে আরও জানালেন : ''প্লেগ থেমে গেছে বলে মনে হচ্ছিল—কিন্তু আমাদের পরের গলিতে এরই মধ্যে আবার দেখা দিয়েছে। জেনারেল প্যাটারসন জানাচ্ছেন, আগামী বছর তা আরও মারাত্মক আকারে দেখা দেবে বলে তাঁদের ধারণা। ব্যাপক আকারে সাফাই কাজের আমাদের যে পরিকল্পনা—সেটাই একমাত্র উপায়।''

অর্থসাহায্যের বড়ই প্রয়োজন। স্বামীজী একশো টাকা দিলেন। ৫ এপ্রিল ইংরেজি সংবাদপত্র ইংলিশম্যান ও স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্লেগ আক্রান্ত বস্তির বর্ণনা দিয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দীর্ঘ পত্র লেখেন নিবেদিতা। ৬ এপ্রিল উক্ত পত্রিকায় সে-পত্র প্রকাশিত হল। সেই পত্রে লিখলেন কয়েকদিনের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন যা যা করেছে : ''কয়েক মাইল দীর্ঘ গলি ও নর্দমা—তিন দিন আগেও যা ছিল জঘন্য নোংরা—আজ তার এমন চেহারা যে, ইংরেজ মহিলা পর্যন্ত সেখান দিয়ে নির্বিকারভাবে হেঁটে যেতে পারবেন।''[৪৯]

আবেদনের ফল মিলল।[৫০] ড. নেল্ড কুক সাহেব পরিদর্শনে এলেন।[৫১]

৬ এপ্রিল সিস্টার নিবেদিতা সাত জনের সঙ্গে আরও পাঁচ জন ধাঙড় নিযুক্ত করলেন।[৫২]

সরকারি সহায়তা ছাড়াই এইরকম সেবাকাজ সরকারি মহলে যথেষ্ট সমীহ আদায় করেছিল। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা ৮ এপ্রিল ১৮৯৯-এর পত্র থেকে উদ্ধৃত করা যাক : ''আমাদের সাফাই কাজ পরিদর্শনের জন্য সরকারি আদেশে প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান মিস্টার ব্রাইটের মতো একজন উচ্চ পদাধিকারীর আগমন একটা বিরাট ব্যাপার। আমাদের সাফাই অভিযানের আগে সেই জায়গাগুলি পরিদর্শন করেননি বলে তিনি দুঃখপ্রকাশ করলেন। তাই তাঁকে বললাম, তিনি যে

ব্যাপারটাকে এতটা গুরুত্ব দেবেন তা আমরা জানতাম না। যদিও এরকমটা আমাদের কাজের ধারা নয়। আমরা মানুষকে সাহায্য করতে চেয়েছি। আমাদের কাছে এটা কোনও লোক-দেখানো ব্যাপার নয়। শেষে সদানন্দকে তিনি নিশ্চিত করলেন এই বলে যে, আমাদেরটাই একটা 'আদর্শ বস্তি' এবং আমাকে বললেন, যদি পরবর্তী সময়ে তাঁকে জানাই তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থ জোগাড় করে দিতে পারেন। মনে হচ্ছে, স্বামীজী এতে খুব খুশি হবেন, কারণ এর ফলে যতদিন প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজটি চলতে পারবে।"

৭ এপ্রিল প্লেগ ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য স্বামীজী নিবেদিতার আবাসে হাজির হন। পূর্বোক্ত ৮ এপ্রিলের চিঠিতেই নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখছেন, ''...তিনি (স্বামীজী) ফেটে পড়লেন—'কুসংস্কারের একটি কথাও নয় (নিবেদিতা স্বামীজীর কোষ্ঠীর কথা তুলেছিলেন)। কুসংস্কারকে তাড়িয়ে তার জায়গায় বসাতে হবে নির্ভেজাল অদ্বৈতকে।...''

ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝার মতো স্বামীজীর চেহারা। ''কাজ চাই—কাজ। এ-সপ্তাহে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হোক—তুমি বক্তৃতা দেবে, আমি সভাপতি—সারা কলকাতার ছাত্ররা আসবে—তারা ঘর ছেড়ে বেরুবে, নিজের হাতে পরিষ্কার করবে শহর। তাদের ধরাতে হবে মৃত্যু-জ্বর—তার মানে বুঝতে পার? গতকাল সারাক্ষণ আমার ছোকরাদের সেই কথাই বোঝাচ্ছিলুম। তারা এখন চাবুক-খাওয়া শ্বাপদের মতো।" টাউন হলে যে-বক্তৃতা হবে তার পোস্টার রচনার কথা পর্যন্ত ঠিক করে ফেললেন স্বামীজী।[৫৩]

স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের ধরাবাঁধা পথে চলার মানুষ নন। 'মৃত্যুকে ভালোবাসা', 'মৃত্যু-জ্বর ধরানো'—মরণের বাতিক ধরানো—এধরনের ভাবনা জগতে দুর্লভ। তা তিনি করে গেছেন, দেখিয়ে গেছেন; প্রাণপ্রিয়দের মরণের মুখে ফেলে দিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ''তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশি হই।"[৫৪] ইস্পাতকঠিন মানুষটির এ এক ব্যতিক্রমী আনন্দযাপন।

কলকাতার প্লেগ-সেবাকার্যে স্বামীজীর মহাপ্রাণের স্পন্দন বহু প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল। তারাও মিশনের কাজে অর্থ ও সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। আত্মজনদের আত্মবলিদানে তৃপ্ত হতেন স্বামীজী। উচ্ছ্বসিতও হতেন। ওই সময়কালের এক ঘটনা। স্বামী সদানন্দ সেবার এসে নিবেদিতা কত একান্তভাবে সেবাকার্যে নিযুক্ত আছেন, তা স্বামীজীকে জানালেন। শুনে স্বামীজী বললেন, ''ঐ প্রকার কার্যোদ্যম—ঐ মনুষ্যত্ব ও সহযোগিতা ছাড়া ধর্ম হতেই পারে না। ঐ দেখ নিবেদিতা কেমন এক কোণে পড়ে আছে, আর ইংরেজরা তাকে সাহায্য করছে। ভগবান তাদের সকলের কল্যাণ করুন।"[৫৫]

৯ এপ্রিল স্বামীজীর কাছে এলেন নিবেদিতা। প্লেগের নানা কথা তিনি তুলে ধরলেন। সক্রিয় কর্মীর কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতার উপর সদানির্ভর প্রকৃত নেতা সে-সব কথা চাপা দিয়ে শুধু বলে উঠলেন, ''প্লেগ, নিবেদিতা, প্লেগ!" আর প্লেগকার্যে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের কথা উঠলে নিবেদিতাকে স্বামীজী বললেন, ''আমাদের লোকগুলি হয়তো তেমন ভদ্র বা মার্জিত নয়; কিন্তু বাঙলাদেশে ওরাই হলো মনুষ্যত্বশালী মানুষ। ইওরোপের মেয়েরা অপুরুষোচিত ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা দেখিয়ে পুরুষত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। বাঙালি মেয়েরা কবে তা করতে শিখবে এবং পুরুষচরিত্রে সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে নিষ্ঠুর টিটকারী দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে?" আশ্চর্যের ব্যাপার হল, স্বামীজী সেদিন নিবেদিতার কাজের প্রতি কোনও উচ্ছ্বাস দেখাননি। এই ছিল স্বামীজীর ধারা—অসাক্ষাতে

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, সাক্ষাতে নীরবতা।[৫৬]

প্লেগ সংক্রমণ রোধের জন্য পরিচ্ছন্নপর্ব প্রতিনিয়ত চলছিল। শ্যামবাজারের নিকটবর্তী নিকিড়ীপাড়া বস্তিতে কাজ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৫ এপ্রিল নাগাদ সেখানকার কাজ শেষ হয়ে এল। ওই ১৫ তারিখেই স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার মেহনী সাহেব নিকিড়ীপাড়ার কাজ দেখে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন ও উৎসাহ প্রদান করেন। ১৭ এপ্রিল চেয়ারম্যান ব্রাইট সাহেব স্বয়ং এই কার্য দেখে অত্যন্ত উৎসাহ দেন।

শিয়ালদহের কাছে মুচিবাগানে একটা মস্ত লম্বা ড্রেন অনেকদিন থেকে অত্যন্ত ময়লায় ভর্তি হয়েছিল। কয়েকজন ভদ্রলোকের অনুরোধে সিস্টার ১৯ এপ্রিল সেই ড্রেন পরিষ্কার করার সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করে দেন। সেই কারণে আগেকার ধাঙড় ছাড়া আরও অনেক কুলি নিযুক্ত করতে হয়েছিল। ৩০ এপ্রিল শিয়ালদহের কাজ শেষ হয়।[৫৭] মিসেস ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার ১৯ এপ্রিল ১৮৯৯-এর পত্রে সেবাকার্যের সংক্ষিপ্ত রেকর্ড :

''গুডফ্রাইডের দিন—৩১ মার্চ।

সদানন্দ সাত জন ধাঙড় নিয়ে বস্তি সাফাই করতে শুরু করল। স্বামীজী আমাদের ১০০ টাকা দিলেন।

বৃহস্পতিবার ৬ এপ্রিল।

স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান কাগজে আমার চিঠি বেরলো—ড. নেল্ড কুক পরিদর্শনে এলেন এবং টাকা আসতে শুরু করল।

সোমবার ১০ এপ্রিল।

আমরা এখন আরও ২৩৫ টাকা জোগাড় করেছি, এবং পাঁচ জন ধাঙড় ও একজন সন্ন্যাসী আমাদের কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছে।

রবিবার ৯ এপ্রিল এবং শনিবার ১৫ এপ্রিল।

এই জেলার জন্য নিযুক্ত সরকারি প্লেগ অফিসার ড. মেহনী বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব নিয়ে আমাদের কাজ পরিদর্শন করে গেলেন—তিনি আমাদের বস্তিটিকে 'মডেল' আখ্যা দিলেন—এবং টাকায় টান পড়লেই তাঁকে খবর দিতে বললেন। সদানন্দ বলল, উচ্চপদাধিকারিকদের এই ধরনের মনোভাব খুবই প্রশংসাসূচক।

এবং স্বামীজীর ব্যবস্থাপনায় এখন এসব নিয়ে আমাকে কলকাতায় ছেলেদের কাছে বক্তৃতা দিতে হবে ২২ তারিখ শনিবার। সেখানে তিনি সভাপতি।

তিনি বললেন, 'তাদের মৃত্যুজ্বর ধরাতে হবে।' ''[৫৮]

আট

ইতোমধ্যে ২২ এপ্রিল বিডন স্ট্রিটের ক্লাসিক থিয়েটারে পূর্বপরিকল্পিত বিপর্যয়কালীন সভাটি অনুষ্ঠিত হল। স্বামীজী সভাপতি। অত্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীজী এসেছিলেন এবং তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ পরুষ সত্য-কঠিন বক্তব্যের পরতে পরতে ছিল বাঙালির বাক্‌সর্বস্বতা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে ধিক্কার। ইংলিশম্যান পত্রিকা ২৪ এপ্রিল লিখল, ''... স্বামী বিবেকানন্দ অবিলম্বে সুস্পষ্ট কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা ছাত্রদের মনে গেঁথে দেন। তিনি বলেন, এ-পর্যন্ত ঝুড়ি-ঝুড়ি তত্ত্বকথা লাভ করা গেছে, কিন্তু বাঙালিরা প্লেগ নিবারণের জন্য কোনো বাস্তব কাজ করে উঠতে পারেনি। জনৈক ইংরাজ সংবাদদাতা সম্প্রতি বাঙালিদের বিষয়ে কঠিন নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন, তাতে বাঙালিরা একেবারে খেপে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ-না বাঙালিরা নিজেদের আলস্য ঝেড়ে ফেলে বাস্তব কাজের দ্বারা নিজেদের মানুষ বলে প্রমাণ করছে—যতক্ষণ-না তারা প্রমাণ করছে যে, তারা কাচের আলমারিতে রাখা সাজানো পুতুলবিশেষ নয়—ততক্ষণ তারা তাদের গায়ে ছিটানো কলঙ্ক দূর করতে, বা স্বদেশের উপরে চাপানো গ্লানি মোচন

করতে পারবে না।"[৫৯]

নিবেদিতা 'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য' বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ একটি ভাষণ দেন। ''বিপুল সংখ্যায় ইউনিভার্সিটি ছাত্রগণ, কিছু ইউরোপীয় মহিলা ও পুরুষ, বিভিন্ন কলেজের বেশ কিছু অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।"[৬০] সভার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন করা ও প্লেগ-প্রতিরোধ কার্যাবলির কর্মী সংগ্রহ করা। নিবেদিতা সেদিন যে-ভাষণ রেখেছিলেন, তা যেন শুধু ভাষণ নয়, বিবেক ও আবেগ-মথিত হয়ে সকলকে কাজে নামার জন্য এক আকুল আহ্বান : ''রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মিরূপে এক্ষেত্রে আমাদের মনোভাব—যদি অন্য কিছু করতে নাও পারি—মানুষের বিপদে অংশ তো নিতে পারি।" তিনি ছাত্রদের আহ্বান জানিয়ে বললেন,''ছাত্রগণ, তোমাদের মা ও বোনেরা দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে বিপন্নের করুণ ডাকে সাড়া দিতে হয়—সেখানে তোমরা সাড়া দেবে না?"[৬১]

তৎকালীন সুশীল শিক্ষিতদের সভায় বস্তিবাসীদের বাস্তব জীবনের রূঢ় চিত্রটি তুলে ধরলেন প্রাণস্পর্শী ভাষায় : ''৩১ মার্চ স্বামী সদানন্দ ও তাঁর ঝাড়ুদার-বাহিনী বস্তি পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ করেন। আগে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে জঘন্য অবস্থা। নর্দমাগুলি এমনই ভটভটে নোংরা যে, তাদের বর্ণনা অসাধ্য— সেদিকে কারও কোনও নজর নেই। অনেক জায়গাতে সেগুলি বুজে বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ সংস্কার করা হয়নি—ফলে কাদা পুকুর পাঁকের জলে—তা এগিয়ে এসেছে ঘরের দরজা পর্যন্ত, যেখানে ছেলে-মেয়েরা খেলছে। একটি বিরাট বস্তির মধ্যে একটি পুকুর এমনই পূতিগন্ধময় যে, মাছগুলি মরে ভেসে উঠেছে।... এই বস্তিতে নর্দমার কোনও বালাই নেই। একটা কোণের দিকে দেখা যায় আট-দশটা বীভৎস নালার মতো ব্যাপার। তিরিশ ফুট দীর্ঘ পাঁকের স্তূপের দুই প্রান্তে দুটি ঘর উঠেছে। এমন বস্তিতে প্লেগের সত্বর আগমন কি কোনও প্রশ্নের বিষয়? জায়গাটা আমরা যথাসাধ্য পরিষ্কার করেছি, যদিও স্থায়ী কাজে কিছু করা সম্ভব হয়নি। আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি তাতে অনেক ফুট উঁচু ময়লার ডাঁই—কত মাস বা কত বছর হাত পড়েনি কে জানে?... অসহ্য দুর্গন্ধ। শুনলাম, এই বিরাট বস্তিটিতে কয়েকদিন অন্তর একটি মেয়ে-ঝাড়ুদার আসে, তাকে আলাদা করে পয়সা দিতে হয়—কয়েক ঘণ্টায় সে যতটুকু পারে কাজ করে যায়। সর্বত্র দেখলাম, সবরকম জঞ্জাল দরজার সামনে ফেলা হয়েছে; আর প্রায়ই দেখা যায়—দুটি বাড়ির মাঝখানকার রাস্তাটি সাধারণ ডাস্টবিন। কাজ আরম্ভ করার সময়ে আমাদের বলা হয়েছিল, সব কিছুই আমাদের বিরুদ্ধে যাবে। এক ভদ্রলোক ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন, 'নেটিভদের তুমি কদাপি পরিষ্কার করতে পারবে না।' এই ঘৃণাকে যুক্তিযুক্ত মনে করার কারণ কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখেছি, জনসাধারণ পরিচ্ছন্নতা- ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। হিন্দুদের ভিতর-বাড়ির পরিচ্ছন্নতা যিনি দেখেছেন তিনি কখনও ধরে নেবেন না যে, বাইরের নোংরা অবস্থা তাদের ইচ্ছার বস্তু।"

নিবেদিতার অভিমত, আসলে অবরোধপ্রথার কারণে মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারে না আর তাদের স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে কোনও শিক্ষা না দেওয়ার ফলেই বস্তিগুলো এতটা আবর্জনায় পূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে!

যে-বস্তিতে দীনদরিদ্র মানুষগুলি থাকে তারা মালিকপক্ষকে ভাড়া হিসাবে টাকা দেয়। কিন্তু স্বার্থপর মালিকপক্ষের কাছ থেকে নিবেদিতা শুনে বিস্মিত হয়েছেন যে, আবর্জনা পরিষ্কারের খরচের দায় নাকি বস্তিবাসীদেরই। হতবাক নিবেদিতা : ''ওরকম কথা কেউ বলতে পারে? শুনে আমি স্তম্ভিত। বস্তির এই গরিব মানুষগুলি—দুবার টাকা

দিচ্ছে, প্রথমতঃ বস্তি মালিকের কাছে, দ্বিতীয়ত সুদখোর মহাজনের কাছে—তারা এমন গরিব যে, দুবেলা খেতে পর্যন্ত পায় না—তারা পৃথিবীর প্রধান এক শহর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার নেবে?" ধিক্কার জানান নিবেদিতা :

"ধিক সেই ধনী লোকগুলিকে, যারা এইসব বস্তির মালিক। ধিক সেই পৌর-কর্তৃপক্ষকে, যারা ঐসব মালিককে শাস্তি দেয় না।"

বক্তৃতার শেষে তরুণদের আহ্বান জানিয়ে নিবেদিতা বলেন, "এই শহরে যারা নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয় এমন প্রতিটি মানুষের সাহায্য আমরা চাই। বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই এগিয়ে এসো—প্রয়োজনীয় কাজ এখনই স্বহস্তে শুরু করে দিই। এই ধরনের কাজ লজ্জাজনক? না, এর গৌরব আমরা দেখিয়ে দেব জনসাধারণকে। কেবল এইভাবেই জনগণ জীবনসত্যের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের পতনের রূপ উপলব্ধি করবার মতো সবল মন অর্জন করবে। এক ধর্মোত্থানের মধ্যে রয়েছি আমরা। প্রেম ও বিশ্বাস এখন স্পষ্ট পরিস্ফুট আমাদের মধ্যে—এসেছে চরম আত্মত্যাগের আহ্বান। প্রভেদ করতে হবে বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের—মৌখিক বিশ্বাসের সঙ্গে রক্তগত বিশ্বাসের। দুঃসাহস ও আত্মত্যাগের প্রহরেই সত্যকারের বিশ্বাসের জন্ম হয়। কলকাতার ছাত্রবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কতজন আছ যারা আমাদের ভ্রাতৃগণের জীবনের এই মহা দুর্দৈবের কালে বিশ্বাসের জ্বলন্ত শক্তি নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারবে? আমাদের মধ্যে এখানে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সগর্বে ভাবেন—আমরা যতই যা-কিছু করি না কেন কদাপি সেই পরমগুরুর (শ্রীরামকৃষ্ণের) দৃষ্টান্তের তুল্য কিছু ঘটাতে পারব না, যিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও গভীর রাত্রে মেথরের বাড়ি গিয়ে নিজের মাথার চুল দিয়ে তার পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন। সে-ধরনের সেবা সাধারণ তপস্যা নয়—তপস্যার শিরোরত্ন। সে-কাজ সম্ভব নয়। তবু তোমাদের মধ্যে কতজন আছ বলো যারা বস্তি পরিষ্কারের কাজে এগিয়ে আসবে? এক্ষেত্রে যদি উঠে দাঁড়াতে হয়—একসঙ্গে উঠব; যদি লুটিয়ে পড়তে হয়—একসঙ্গে পড়ব। বিপদের দিনে যে-মানুষ নিজের ভাইকে ত্যাগ করে, অচিরে দুর্ভাগ্য গ্রাস করে তাকে। দরিদ্রের প্রয়োজনই আজ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন—এসো, বাস্তব কাজের দ্বারা আমরা তা প্রমাণ করি।"

ছাত্রদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা দিল। পনেরো জন স্বেচ্ছায় নিবেদিতার সঙ্গে কাজে যোগ দিল। প্রতি রবিবার ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রিটে সকলে একত্রিত হয়ে কাজের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হত এবং পরবর্তী কাজের ধারা বিষয়ে সকলে অবহিত হত।[৬২] এরই মধ্যে ১মে ওয়ার্ড নম্বর ১-এ আবার কাজ আরম্ভ হল।[৬৩] সমস্ত নগরীতে অত্যন্ত আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। অদম্য উদ্যমে নিবেদিতা লড়তে লাগলেন। মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিদিন প্রায় একশো জন। টিকা, ওষুধ, শুশ্রূষাকারী—সবকিছুরই অভাব। মারি-পীড়িত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে খোঁজ-খবর করেন নিবেদিতা। 'Scanvanger Swami' সদানন্দের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকের দল তো সাফাই অভিযানে লেগেই আছে। কারণ কোনও অঞ্চলে ব্যাপক আকারে প্লেগ ছড়ানোর আগে সংক্রামিত এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে বীজাণু সৃষ্টিরোধ করার প্রচেষ্টাই আসল।

প্লেগ প্রতিরোধের স্বাস্থ্যবিধিতে বলা হয়, কীটনাশক দিয়ে ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, জিনিসপত্র আগাপাছতলা পরিষ্কার করতে হয়। এমনকী গৃহপালিত পশুপাখিদের পর্যন্ত ধোয়ামোছা করতে হয়। ইঁদুরের গর্তগুলির ভিতরে কীটনাশক-মিশ্রিত জল ঢেলে গর্তগুলি একেবারে বন্ধ করা প্রয়োজন। যে কোনও সংক্রামিত এলাকার পাঁচ মাইল পরিধি

পর্যন্ত এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আওতায় আনা জরুরি। এইরকম অভিযান চালালে কিছুদিনের মধ্যেই সংক্রমণের সূচক শূন্যে পরিণত হয়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরদারি, প্লেগ যাতে সংক্রামিত না হয়। এছাড়া microbiology, scrology, entomology, epidemiology ও ecology-র উপর নজরদারি অতি আবশ্যক। অনুসন্ধান ও নজরদারির ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিচার এবং দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশ করা হয়।[৬৪]

নিবেদিতার উপযুক্ত পরিচালনায় প্লেগ সেবাকার্য চলতে লাগল। কাঠের ছাদ-দেওয়া একটা চালায় অস্থায়ী চিকিৎসালয়। কটা বিছানা খালি হল বার বার খবর নিতে হয় নিবেদিতাকে। কারণ নতুন রোগী অপেক্ষমাণ। *(ক্রমশ)*

তথ্যসূত্র

৩০। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), খণ্ড ৩, পৃঃ ৮৬

৩১। দ্রঃ *Complete Works of Sister Nivedita* (Sister Nivedita Girls' School: Kolkata, 1967), Vol. II, pp. 346-47

৩২। দ্রঃ Ibid

৩৩। *স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্রসম্ভার*, সম্পাদক : স্বামী ঋতানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪), পৃঃ ৭৩

৩৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), পৃঃ ৬৩২, ৬৩৮

৩৫। স্বামী প্রভানন্দ, *ব্রহ্মানন্দ-চরিত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ১২৪

৩৬। *স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্রসম্ভার*, পৃঃ ৭৪-৭৫

৩৭। তদেব, পৃঃ ৭৬

৩৮। *স্বামী অখণ্ডানন্দের পত্রসমগ্র*, সম্পাদক : স্বামী ঋতানন্দ,(উদ্বোধন কার্যালয়,২০১৫),পৃঃ১০২

৩৯। দ্রঃ *ব্রহ্মানন্দ-চরিত*, পৃঃ ১২৪

৪০। *উদ্বোধন*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, মহামারী (প্লেগ) ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ, ডা. শশিভূষণ ঘোষ

৪১। লিজেল রেমঁ, *ভারতকন্যা নিবেদিতা*,পৃঃ ১৫৮

৪২। তদেব, পৃঃ ১৬৩

৪৩। দ্রঃ Editor: Shankari Prasad Basu, *Letters of Sister Nivedita*, (Nababharat Publishers: 1982, Kolkata) Vol I, p. 81[এরপর, *Letters*]

৪৪। Ibid, p. 80

৪৫। *উদ্বোধন*, ৯১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৩৯৬; প্লেগের কলকাতায় নিবেদিতা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৪৬। *ভারতকন্যা নিবেদিতা*, পৃঃ ১৬৫

৪৭। *উদ্বোধন*, ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬

৪৮। দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ* (মণ্ডল বুক হাউস : কলকাতা, ১৪১৮), খণ্ড ৪, পৃঃ ১৩১, টীকা

৪৯। *উদ্বোধন*, ৯১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৩৯৬; প্লেগের কলকাতায় নিবেদিতা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৫০। *উদ্বোধন*, ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা

৫১। তদেব

৫২। তদেব

৫৩। দ্রঃ *Letters*, Vol I, p. 107

৫৪। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৯, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), পৃঃ ৮৫

৫৫। *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৭৩

৫৬। দ্রঃ তদেব

৫৭। *উদ্বোধন*, ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা

৫৮। *Letters*, Vol I, p. 120

৫৯। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৩২

৬০। *উদ্বোধন*, ৯১ বর্ষ ৮ সংখ্যা

৬১। তদেব

৬২। *উদ্বোধন*, ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা

৬৩। তদেব

৬৪। দ্রঃ K. Park, *Park's Textbook of Preventive & Social Medicines* (M/s. Banarasidas Bhanot Publishers, 17th edition)